[illegible]: [illegible]

[illegible]

গন্ধটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে অঞ্জনকে। আর তাড়া করে বেড়াচ্ছে ছোট উজ্বল সুন্দর দুটো চোখ। কোথাও স্বস্তিতে দুদন্ড বসতে দিচ্ছে না। পাশের ঘরটার বন্ধ দরজার দিকে তাকালেই কেমন যেন একটা ভয় চেপে বসছে ওকে। দরজা খুললেই ঝাঁপ দিয়ে ঢুকে পড়বে সেই তীব্র গন্ধটা। উগ্র, পচা, নরক থেকে উঠে আসা সেই গন্ধ যেন অঞ্জনের আত্মাকে পর্যন্ত নোংরা করে দিচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে আসছে ওই গন্ধটা? সব তো তন্নতন্ন করে খোঁজা হল!

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কদিন আগে। বাড়ির তিনতলায় অঞ্জনদের শোবার ঘরের পাশে একটা বড় ঘর। এই ঘরেরই লাগোয়া একচিলতে জায়গায় ছোট্ট একটা রান্নাঘর। এই রান্নাঘরটা স্পেশালি বানানো হয়েছিল ওর সেজপিসির জন্য। ভদ্রমহিলা ছিলেন অবিবাহিত। অঞ্জনকে মানুষ করার পেছনে ওনার একটা বড় অবদান আছে। তো অভিমানী, জেদি এই সেজপিসির শেষ জীবনের আশ্রয়স্থল ছিল এই ঘর। তার জন্যই এই রান্নাঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রায় দুই বছর শয্যাশায়ী থেকে তিনি এইঘরেই অবশেষে তিনি মারা যান। তার কিছুদিন পরে এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয় আর এক অসুস্থ মহিলার। তিনি অঞ্জনের শাশুড়ি। তিনিও এই ঘরেই মারা যান। তারপর থেকে আর কেউ এইঘরে থাকে না।

তাও অনেকদিন হয়ে গেল। তবে রান্নাঘরটা অঞ্জনরা ব্যবহার করে। এই ঘরেই ওদের ফ্রিজ, মিডসেফ, বাসন-কোশন, মালবিকার গানের সরঞ্জাম সব থাকে। সব ঠিকঠাক শান্তিতেই কাটছিল।
ঝামেলা শুরু হল অক্টোবরের এক সন্ধ্যায়। মফস্বল এই শহরে সবে হালকা ঠান্ডার আমেজ শুরু হয়েছে। রোববার সন্ধের দিকে ওই ঘরটায় কোনও একটা কাজে গেছিল মালবিকা। লাইট জ্বালাতেই হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে সে। অঞ্জন ছুটে এসে শোনে কাচের মিডসেফের পাশে এইমাত্র মালবিকা একটা প্রমাণ সাইজের ধেড়ে ইঁদুর দেখেছে। আলো জ্বালতেই ওটা স্টিলের আলমারিটার নিচে পালিয়েছে। বৌ-এর লাফালাফিতে বাধ্য হয়ে অঞ্জনকে গুঁড়ি মেরে খোঁজার চেষ্টা চালাতে হয়। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। হাল ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে আসে ওরা। দুতিন দিন বাদে ওরা আবিস্কার করে ফ্রিজের পাশে ইদুরের মল ছড়িয়ে রয়েছে। অঞ্জন তাজ্জব হয়ে ভাবে এই তিনতলায় ইঁদুর আসছে কী করে! তাহলে কি পুবের বারান্দায় ঝুঁকে পড়া মেহগনি গাছ বেয়েই আসছে ওটা। ভারী অবাক ব্যাপার তো! এরও কয়েকদিন বাদে টুকরো টুকরো করে কাটা কয়েকটা হ্যান্ডটাওয়েল পাওয়া গেল ঘর থেকে। নাঃ! বড় উৎপাত শুরু করেছে তো ধাড়িটা।

কিছু একটা করা দরকার। বাধ্য হয়ে বাজারচলতি র‍্যাটকিলার এনে আটার সঙ্গে মেখে ছড়ানো হল ঘরে। ওমা! কোথায় কী! বিষ তো বিষের মতই পড়ে রইল। স্পর্শ করেও দেখে নি বাছাধন।
নভেম্বরের গোড়ার দিকে নতুন চমক। সন্ধের দিকে ঘরে ঢুকে অঞ্জন দেখতে পেল মিডসেফে নিচের স্লাইডিং ডোর একটু ফাঁকা। আর কাচের ওপাশে একজোড়া ছোট ছোট চোখ জুলজুল করছে। অঞ্জনকে দেখে সে ঘাড় উঁচু করে। গোঁফ নাড়ায়। ল্যাজও তুড়ুক তুড়ুক করে নড়তে থাকে। কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। না, এ তো ধেড়ে নয়, সুন্দর উজ্জ্বল একটা নেংটি। স্লাইডিং ডোর সরালেই তো বাবাজীবন ফাঁদে। মালবিকাকে ডাকে ও।

একটা ছোট টর্চ নিয়ে আলো ফেলে নেংটিটার দিকে। কী সুন্দর উজ্জ্বল দুটো চোখ। দুহাত সামনের দিকে জড়ো করে একমনে কী একটা কুরকুর করে খেয়ে চলেছে। তা হলে তো শুধু ধেড়ে নয়, এও রয়েছে। তবে কী গোটা একটা ইঁদুরের পাড়া নেমে এসেছে এই ঘরে? মালবিকা যথারীতি চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। কালই একটা কিছু বিহিত কর। না হলে আমি এবাড়িতে থাকবো না। কালই নাগেরবাজার চলে যাব।

মহা ফ্যাসাদে পড়েছে অঞ্জন। কী করে এখন! বিষ তো দেওয়া হয়েছিল। কাজ হয়নি। অগত্যা সমীরকে ফোন করে। ও সব ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। যদি কোনও আলোকপাত করতে পারে।

সমীর ফোনে যা বলল তার সারমর্ম হল, বাজারে একধরনের র‍্যাটকিলার পেস্ট এসেছে যাতে ইঁদুরগুলো আটকে যায়, তবে সেগুলো ছাড়িয়ে ফেলে দেওয়া বড় ঝক্কি। পুরোনো মাউসট্র্যাপও ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া নতুন একধরনের র‍্যাটকিলার বিস্কুটও পাওয়া যাচ্ছে। যেগুলো একেবারে অব্যর্থ। এগুলো খাবে এখানে আর লাশ পড়বে শ্মশানে। অর্থাৎ ঘরে খাবে আর বাইরে মরবে। যেটা তোমার খুশি কেনো। ছোটবাজারে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে পাওয়া যাবে।

শনিবারের বারবেলায় অবশেষে ওই শেষ কিসিমের অর্থাৎ বিষ-বিস্কুটই কিনে আনল অঞ্জন। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, খালি ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে রাখো। পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল ওই চার পাঁচ টুকরো বিস্কুটের একটাও আর পড়ে নেই। মালবিকার মনে একটু স্বস্তি খেলে গেল। দু-তিনদিন আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। অঞ্জন মালবিকা ক্রমেই মুষড়ে পড়ছে। তা হলে কি বিষও হজম করে নিল এরা?

খেলাটা বোঝা গেল মঙ্গলবার সকালে। ঘুম ভেঙ্গে সকালে চা বানাতে ওঘরে ঢুকতে গিয়ে আঁতকে কঁকিয়ে ওঠে মালবিকা। পায়ের কাছে একটা ছোট ইঁদুর পড়ে আছে। চিৎকার শুনে অঞ্জন দৌড়ে আসে। মরে নি বেচারা।

এখনও ধুকপুক করছে। নড়ার শক্তি নেই। একটা হাল্কা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘরটায়। কিন্তু দুর্গন্ধ কেন? ওটা তো এখনও জ্যান্ত! ঝুঁকে দেখে সেই উজ্জ্বল সুন্দর দুটো ছোটছোট চোখ! এ কি সেই নেংটিটা? একটু মনখারাপ হয়ে যায় অঞ্জনের। কিন্তু কী আর করা। ওটাকে তুলে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে পিছনের বাগানে ছুঁড়ে দেয় সে। এবার হয়ত একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে।

কিন্তু সেদিন বিকেল থেকেই ঘরের মধ্যে সেই দুর্গন্ধটা যেন ক্রমশ বাড়তে থাকে। পরেরদিন কাজের মাসি লক্ষীদি মিডসেফের তলা থেকে বার করল মাঝারি সাইজের একটা ইঁদুরের মৃতদেহ। ও-ই ওটাকে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করল।

জায়গাটায় ফিনাইল ঢালা হল। কিন্তু মজার কথা দুর্গন্ধ কমল না। বরং ক্রমশ যেন বাড়ছে। খাটে, আলমারির গায়ে, পর্দায় সর্বত্র সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে যেন। ঘরে ঢুকলে ভক করে সেই গন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ে। গা গুলিয়ে ওঠে। বমি পায়

। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। কী করে এই গন্ধের হাত থেকে যে রেহাই মিলবে কে জানে। তা হলে কি আরো ইঁদুরের দেহ রয়েছে এই ঘরে?

পরদিন যা বেরোলো তা এককথায় বীভৎস। খাটের নীচে মাছির আনাগোনা দেখে সন্দেহ হওয়াতে নীচু হয়ে টর্চ ফেলে যা দেখা গেল তাতে হতভম্ব অঞ্জন। এক বড় ধেড়ে ইঁদুরের আধগলা দেহ, যার মধ্যে ম্যাগট গিজগিজ করছে।

মালবিকা তো বমিই করে ফেলল ঘেন্নায়। লক্ষ্মীদিকে ডেকে নানান কসরত করে সেই দেহ ফেলে দেওয়া হল পাশের জমির এক গর্তে। গন্ধটা কিন্তু লেগে গেল নাকে। যেতেই চায় না। পাগলের মত অবস্থা। মরীয়া হয়ে অঞ্জন ঠিক করে আজ অফিসে না গিয়ে ও এটার একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে। মালবিকা তো প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে।

কাজে নেমে পড়ল অঞ্জন। খাট সরিয়ে, মিডসেফ সরিয়ে, আলমারি ফ্রিজ সব ওলটপালট করে দেখতে লাগল কোথায় এই বদমাস ইঁদুরের ঠিকানা? কিন্তু আশ্চর্য কোথাও আর কিছুই নেই। অবশেষে ফিনাইল ঢেলে সারা ঘর ধোয়া হল। ঘরের মধ্যে সুগন্ধি ধূপকাঠি ধরিয়ে দেওয়া হল। এসব করতে করতে সন্ধে। ক্লান্ত শরীর আর মন নিয়ে ওরা যখন শুতে গেল রাতে তখন মনে এক অদ্ভুত আনন্দ। যাক আর কিছুই নেই ওই অলুক্ষুণে ঘরে। ওই নারকীয় গন্ধ থেকে এবার নিশ্চয়ই মুক্তি।

ভোর হতে না হতে মালবিকা বলে, চল তো দেখি ব্যাপারটা কতদূর। অঞ্জন বলে, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। ও ঘরে আর আছেটাই বা কী আর হবেই বা কী? মালবিকা বলে, চল আজ একটু জমিয়ে চা খাই। তুমি আজও অফিসে ডুব মার।

চা বানাতে দুজনেই ছিটকিনি খুলে ঘরের মধ্যে ঢোকে। ঢুকতেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই দুর্গন্ধ। মালবিকা দু হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে কেঁদে ওঠে। অঞ্জন তো হতভম্ব। আবার সেই গন্ধটা যেন নাক দিয়ে গলার ভিতর ঢুকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। গতকালের খাওয়া ভাত যেন এক্ষুণি উঠে আসবে পেট থেকে।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই গন্ধ ওদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কাপ, প্লেট, বাসন কোশন,ফ্রিজ মায় খাবার জলের বোতল সব জায়গায় সেই একই গন্ধ। ইদানীং ওঘর থেকে যেন শোবার ঘরেও ছড়িয়েছে গন্ধটা। বিছানা, বালিশে,জামাকাপড়ে এমন কি গায়েও যেন সেই গন্ধ।

মালবিকাও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ভালো করে খেতে পারে না, কথাও কম বলছে, চুল আঁচড়ায় না। ওর সবসময় মনে হচ্ছে গন্ধটা যেন ধীরে ধীরে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে ওর সারা শরীরে। সর্বদা সর্বত্র শুঁকে শুঁকে ওই গন্ধের ভূত যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। গতকাল রাতে অনেকদিন পরে তারা যখন ঘনিষ্ঠ হয়েছিল মালবিকা অঞ্জনের সারা গা শুঁকে শুঁকে হঠাৎ বলে ওঠে , এই তো, এই তো সেই গন্ধ। উঁহ! পচে গেছে, সব পচে গেছে। সব মরা ইঁদুর হয়ে গেছে। বলতে বলতে ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ভোরে উঠেই পাগলের মতো অঞ্জন সমীরকে ফোন করে। ও ব্যাপারটা আগে থেকেই খানিকটা জানত। সমীর শান্ত গলায় বলে, তোকে তো একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে নিতে বলেছিলাম। শুনলি না। আজই মালবিকাকে কলোনি মোড়ের ডাঃ গৌতম বোসকে দেখিয়ে নে একবার। উনি খুব ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট।